অদামৃতকথা বিষয়ে দুটি কথা

মৈনাক বিশ্বাস

অতিমারীতে যখন নাট্যাভিনয় বন্ধ, তখন এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ব্রাত্য বসুর *অদামৃতকথা* ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। বই হয়ে বেরোয় ২০২২-এ। প্রতি রবিবার উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতাম ওই কাহিনির পরের কিস্তির জন্য। শেষ কবে এইভাবে বাংলা উপন্যাস পড়েছি মনে পড়ছে না। সেইসময় থেকে নাটক থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ব্রাত্য নাটক নিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। *অদামৃত*-র পরে পরেই লিখলেন *দ্যূতক্রীড়ক* (২০২৩)। আর এখন ধারাবাহিক লিখছেন *উদ্ভাসিত মান্দাস*। *অদামৃত*-র অদা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃত অমৃতলাল বসু। পরের দুটি উপন্যাসের নায়ক শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ১৮৭২-এর আশেপাশে শুরু হয়ে কালক্রম ধরে এগিয়ে চলেছে এই নাট্য আখ্যানপর্ব। *অদামৃত*-র শেষদিকে তরুণ হেমেন্দ্রকুমার রায় অমৃতলালকে বলছেন এক নতুন নটের কথা, যাঁকে ওঁরা ভবিষ্যৎ বাংলা নাটকের প্রধান পুরুষ বলে মনে করেন। তিনি শিশির ভাদুড়ি। এইভাবে এক কাহিনি পরেরটার আভাস দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এরা কেমন ইতিহাস, কী অর্থেই বা উপন্যাস? দুটো তো এক জিনিস নয়; একটাকে আমরা জানি ঘটিত বাস্তবের খতিয়ান হিসেবে, অন্যটাকে রচিত কাহিনি বলে। কিন্তু বিশ শতকের শেষ দিকটায় নানা তর্ক তুলে লোকে ব্যাপারটা একটু জটিল বলে প্রতিপন্ন করেছে। উনিশশো সত্তর-আশির দশকে যাকে হিস্টরিয়ানস ডিবেট বলা হয়েছে তাতে একটা প্রশ্ন ছিল এই নিয়েই — ইতিহাস কি গল্প বলে না? সেও তো আখ্যানের নিয়মে মুখ্য চরিত্র, ঘটনাক্রম, কার্যকারণ সাজায়। অজস্র ঘটনা বাদ পড়ে যায়, আরও সহস্র কথা কেউ জানতেই পারে না। বহু দিকে ছড়ানো ক্রিয়া একমুখী শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। কাজেই ইতিহাসও তো একরকমের রচিত আখ্যান। এসব তর্কাতর্কির শেষে দেখা গেল ইতিহাসের একশো ভাগ সত্যতার দাবি খানিকটা আপেক্ষিক বলে মেনে নিচ্ছে লোকে। যদিও এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে উপন্যাস আর ইতিহাস একই রকমের আখ্যান নয়। দুটো দুই অর্থে নির্মাণ। দুটোর সত্যও আলাদা।

এইসব তর্কাতর্কির পরের সময়টায় বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে যা ইতিহাস ঘেঁটে, বিস্তর বইপত্তর পড়ে লেখা। পরিশ্রম করে সেখানে ইতিহাসের খুঁটিনাটি তুলে আনা হয়েছে, পরিচিত চরিত্রদের ঘিরে তৈরি করা হয়েছে নানা কল্পিত চরিত্রের নকশা। আগে যাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হত এ সেই জিনিস নয়; একে হয়ত ইতিহাসের উপন্যাস বলা যায়। কাছাকাছি অতীতের দলিল ঘেঁটে আধুনিক কালেরই একটু দূরের নায়কদের আবার হাজির করে এই ধরনের লেখা। মনে হয়, আগের থেকে এতে বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছেন লেখক ও পাঠক। অন্য ভাষার কথা ভাল জানি না, কিন্তু ইংরেজি বা বাংলায়

এই জাতের আখ্যান প্রচুর লেখা হচ্ছে। *কেরী সাহেবের মুন্সী*-র (১৯৫৮) মুখবন্ধে প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন ইতিহাসের সত্য আর ইতিহাসের সম্ভাবনা মিশিয়ে বইটি লিখেছেন। *অদামৃতকথা*-র লেখক সেইরকম অর্থে ইতিহাসের উপন্যাস লিখেছেন। কেবল এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনার কল্পনা একটু ভিন্ন সুরে বাঁধা। কারণ, কেরী বা রামরাম বসুর কলকাতা ও বাংলা দেশ আমাদের থেকে যতটা দূরে সরে গিয়েছে, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়াকার কলকাতা তত দূরবর্তী নয়।

বস্তুত, কলকাতা এই উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। শহরটা শুধু পটভূমি নয়, তার বেড়ে ওঠা, বদলে-যাওয়া, চরিত্র আর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের বেষ্টন করে কলকাতা নিজের একটা আলাদা উপস্থিতি তৈরি করছে। শহরের রাস্তা খাল পুকুর বাড়ি পৌরকর্ম স্বাস্থ্য নির্মাণ জনগণনা খাদ্য রেল ব্যবসা বাজার সবই একটা চলমান মানচিত্রের মধ্যে গতিশীল দশায় উপস্থিত। উপন্যাসের প্রথম দিকে (পৃ ২৭-৩০) কলকাতার যে বিবরণ পাই, আর শেষ দিকে (পৃ ২১৪-২১৮) যে রাত্রির কলকাতায় অমৃতলাল ভ্রমণ করেন তার মধ্যে অনেকটা ফারাক। গল্প যখন শুনছি তখন আড়ালে যেন সঞ্চরমান এই শহর ভেকবদল করে চলেছে, তার নতুন হাত পা গজাচ্ছে, আলো শকট পথ ইমারতের নতুন তন্ত্র তৈরি হচ্ছে। শহরটাও যে একটা মঞ্চ, সেটা তখন টের পাওয়া যায়।

মঞ্চ আরেক প্রধান থিম। উত্তর কলকাতার এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে কাহিনির যে ছক তৈরি হচ্ছে তাতে চরিত্রেরা মঞ্চের কাছে, মঞ্চ চরিত্রের কাছে আসছে আর সরে যাচ্ছে — এইরকম এক চলাচলের ছবি পাওয়া যাচ্ছে পড়তে পড়তে। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা তো হল, কিন্তু তার কোনও একটা নিজের জায়গা নেই। বাঁশ, কাঠ, কাপড়ের স্টেজ একবার এর বাড়িতে, একবার ওর মাঠে বসানো হচ্ছে। নামও ঘনঘন বদলে যাচ্ছে। আবার চলতি কোনও হলে ঢুকে হয়ত কিছুদিন চলছে সেই থিয়েটার। এ হল ১৮৭২-এর পরের কিছুটা সময়। তারপরে যখন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রমুখ, আর তাঁদের মতোই সব বাজি রেখে মাঠে নেমে পড়া বিনোদিনী, তারাসুন্দরীদের দল পাবলিক থিয়েটারকে বঙ্গজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছেন, তখনও মঞ্চের এই জঙ্গম দশা। এর মধ্যে নানা রূপে, নানা স্থানে বিরাজ করা নানা 'স্টার থিয়েটার' তো আছেই, বিশেষ করে গল্পের সুতো ধরে ধরে বহুরূপীবৎ হাজির হয়েছে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের 'স্টার'। হাতবদল হয়ে সে কখনও হচ্ছে 'এমেরল্ড', কখনও 'ক্লাসিক', তারপর 'কোহিনূর', শেষে গিয়ে 'মনমোহন'। অতঃপর ধ্বংস। এও এক অস্থির ভেকবদলের গল্প, উপন্যাসের তলায় তলায় বইছে।

আরও স্পষ্ট সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে চরিত্রদের মধ্যে। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু, অমৃতলাল এই মঞ্চ থেকে ওই মঞ্চে যাচ্ছেন, আসছেন। তার মধ্যে প্রায়শঃ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, নাটক ব্যর্থ হচ্ছে, কলহ বিবাদে একে অন্যের থেকে ছিটকে যাচ্ছেন। থিয়েটার মাত্রেই যে ঘরছাড়া জীবন, মঞ্চ যে গৃহের বিপরীত পরিসর, নটের জীবন যে অশান্ত অস্থির — তার প্রধান প্রমাণ হিসেবে রয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর। শুধু কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রেক্ষাগৃহে নয়, রোজগারের আশায় সারা দেশ জুড়ে এই দল ওই দলের সঙ্গে নাটক করে বেড়িয়েছেন, নানা ভাষায়। যেখানে ওঁর সত্যিকার প্রতিষ্ঠা সেই শহরে অনেক সময় করবার মতো কোনও কাজ পাননি, প্রায় কখনোই তাঁর অর্থের অভাব কাটেনি। এই আখ্যানে ওঁর মধ্যেই চলমান নটসত্তার সবচেয়ে জোরালো ছবিটা পাওয়া যায়।

থিয়েটারে নেমে এঁরা ঘর ছাড়ছেন, সংসারে ব্যর্থ হচ্ছেন, দর্শকের আদর পাচ্ছেন, সমাজের নিন্দে জুটছে। এরই মধ্যে নিজের মঞ্চ, নিজের যে বাসা খুঁজছেন নট তা কখনোই পাচ্ছেন না। *দ্যূতক্রীড়ক*-এ দেখছি এই কাহিনিই চলে আসছে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জীবনে। আমরা জানি, গল্পটা এখনও একই ধাঁচে চলেছে, সমাজ অর্থনীতি যতই আমূল বদলে গিয়ে থাকুক। কিন্তু এ শুধু অভাবের কথা নয়, সম্ভবত এর

মধ্যে গভীরতর এক সত্য রয়েছে। এবং সরাসরি না বলেও সেই সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে *অদামৃতকথা*। এই দুর্ভাগা বাংলা দেশে নাট্যশিল্পী কোনোদিন অনটন, নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পাননি। সেদিক থেকে দুনিয়ার বহু দেশের থেকে আমাদের থিয়েটারের ইতিহাস আলাদা ঠিকই। অন্যদিকে আবার সব দেশেরই সর্বজনীন এক সত্য নটের এই আশ্রয়হীনতা। বহু রূপ গ্রহণ করবার মধ্যে যে মুক্তি তার সঙ্গে ওতপ্রোত থাকে নিরাশ্রয় হয়ে থাকার দুঃখ ও শঙ্কা। উপন্যাসের মূল চরিত্রদের মধ্যে এই লক্ষণ বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার মতো।

কিন্তু মূল চরিত্র কারা? উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ, বিষয়ী বা সত্তা জিনিসটাকেই খণ্ডিত করে তুলছে এই কাহিনি। অমৃতলালকে দিয়ে বারাণসীর ঘাটে শুরু। তাঁকে দিয়েই যখন শেষ হচ্ছে ততদিনে অন্যেরা বেশির ভাগই মৃত, এক অমৃত নাম সার্থক করে তিনি বেঁচে রয়েছেন। ঘর-সংসার উৎসন্নে গেছে, কিন্তু নিজের অল্প এক আশ্রয় খুঁজে নিতে পেরেছেন একমাত্র তিনিই। আজ যার নাম শ্যামবাজার এ ভি স্কুল তার একটি ঘরে রোজ অনেকটা সময় নিয়ে বসছেন, স্কুলটাকে দাঁড় করাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অমৃতলালের জীবনের দুই বন্ধনীর মধ্যে ধরা আছে বাকিরা। কিন্তু কোনও একজনের চোখ দিয়ে আমরা সময়টাকে দেখছি না। মাঝে মাঝে অর্ধেন্দুশেখর চলে আসছেন কেন্দ্রে, তাঁকে ঘিরে বিবরণ এগিয়ে চলেছে, কখনও তাঁর জবানীতেই শুনছি ধারাবিবরণী। এই গল্পের দুই নায়ক, সেটা প্রথম থেকেই ধরিয়ে দেওয়া আছে। অতএব একটি কেন্দ্রীয় চেতনা অবলম্বন করে এই আখ্যান এগোবে না আমরা জানি। কিন্তু ব্যাপারটা তার থেকেও জটিল। এর মধ্যে তৃতীয় এক নায়ক আছেন — গিরিশচন্দ্র। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তাঁর চিন্তাসূত্র ধরেই উনিশ শতকের শেষ পাদের এই ইতিহাস লেখা হচ্ছে (উদাহরণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। ফলে নায়কের ভূমিকাতেও যাতায়াত চলছে, রূপবদল ঘটছে।

এর সঙ্গে আরেকটা চেতনা তো জুড়ে যাচ্ছেই — কথক নিজে পরিবেশন করছেন তথ্য, বিশ্লেষণ ইত্যাদি। কিন্তু সেখানেও এক খণ্ডিত সত্তার বিন্যাস দেখছি। কথকের ভাষা বদলে বদলে যাচ্ছে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। একেবারে শুরুতে বারাণসীর দৃশ্য-বর্ণনের গদ্য এইরকম :

> অতএব এই বুড়ুয়ামঙ্গলের দিনে, অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ অবলোকনকল্পে, সমাগত প্রাবৃটদিনান্তশোভা সমগ্র জাহ্নবীর বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। সম্পূর্ণশরীরা যৌবনের পরিপূর্ণতায়, উন্মাদিনী স্রোতস্বিনীর তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হয়ে, বারাণসীবিভূষিতা মণিকর্ণিকার কূলে ঈষৎ ঈষৎ প্রতিঘাত করছিল।

এর কিছু পরে ধনকুবের বালক ভুবন নিয়োগীর বর্ণনা :

> কালক্রমে এই বালক যখন দুর্দান্ত কিশোর হয়ে ওঠে, তখন নাকি সে ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো করতে শেখে। বিদ্যাদেবীর সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র মানসিক যোগাযোগ না-থাকার দরুন ভুবন ভাসানের শোভাযাত্রায় চিৎপুর রোডের বেশ্যাদের হাজার জোড়া বেনারসি শাড়ি বিলোতে শুরু করে। আজকাল প্রদীপের শিখায় নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায় সে।

ভুবনের সঙ্গে দোস্তি হওয়ার পরে তার সাহায্যেই অর্ধেন্দু, অমৃত, ধর্মদাস সুরেদের পাবলিক থিয়েটারের পরিকল্পনা প্রথম দানা বাঁধে। এই ইয়ার দোস্তির পরিচ্ছেদের এপিগ্রাফ হিসেবে রয়েছে হৃষীকেশ মুখার্জির *নমকহারাম* ছবির আনন্দ বকশি লিখিত গানের লিরিক: 'দৌলত অউর জওয়ানি/ একদিন খো যাতি হ্যায়' ইত্যাদি। উপরের প্রথম উদ্ধৃতির ভাষা দ্বিতীয়টির থেকে বেশি সিরিয়াস এমন ভাবার কোনও অবসর নেই। পরিহাস-প্যারডি কথকের অন্যতম অবলম্বন। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার মতো এক স্বর থেকে অন্য স্বরে যাতায়াত — যেন এক নয়, একাধিক ব্যক্তি কথা বলছে। কথকের নিজের কথা কোনটা, আর কোনটা সেই সময়কার কোনও নাট্য, নকশা বা নভেলের নকল করা কথা তা বোঝা

ভার। মাঝে মাঝে আবার আসছে সরাসরি রেফারেন্স বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনার বিবরণ; পরিচ্ছেদের মাঝে আসছে 'কথিকা', 'প্রসঙ্গকথা' নামে কিছু অংশ। ফলে নানা কথকতা শুনছি — কাহিনি, দলিল, চুটকি মন্তব্য, স্বগতোক্তি সব তার মধ্যে মেশানো। এই কোলাজ-ধর্মিতা দুনিয়া জুড়ে উপন্যাসের একটা লক্ষণ হয়ে উঠছে বললে ভুল হবে না।

খণ্ডিত সত্তার কথা, চলাচলের কথা, আলাদা করে উল্লেখ করছি কারণ এই উপন্যাসের একটি অনুচ্চার কিন্তু স্পষ্ট থিম অর্ধেন্দুশেখর আর অমৃতলালের মধ্যে সমকাম-ধর্মী সখ্য। আগাগোড়া গল্পের নিচে স্রোতের মতো বইছে এই থিম, কখনও একেবারে উপরে উঠে আসছে — বিশেষ করে অমৃতলালের মধ্যে, তাঁর চেহারার বর্ণনায় (এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তিও উল্লেখ করা আছে), তাঁর তীব্র অভিমান ভালবাসায়। অর্ধেন্দুশেখরের চরিত্রে এর আভাস পাওয়া যায় দূরে কাছে থেকেও সারাজীবন এই বন্ধুর প্রতি তাঁর অটুট মমতায়, মৈত্রীবোধে। উপন্যাসটা পড়তে গিয়ে এর প্রথম ইঙ্গিতে একটু ভয় হয়েছিল। এ আবার সেই সমকামিতার ফ্যাশনেবল চর্চা নয় তো! বাণিজ্যিক ছবি থেকে ওয়েব সিরিজ, গ্রুপ থিয়েটার থেকে পপুলার সাহিত্য সর্বত্র এই বিষয়টির তরল এক উপস্থাপনা দেখে বোঝা যায় ইদানিং রক্ষণশীলদেরও কিছু এসে যায় না এই নিয়ে মাতামাতি করতে।

কিন্তু স্বস্তি হল দেখে যে *অদামৃতকথা* একেবারেই ওই ফ্যাশনের পথ মাড়ায়নি, স্থূল করে তোলেনি ব্যাপারটাকে। বরং সম-আকর্ষণের মধ্যে যে সত্য রয়েছে, সবার ক্ষেত্রেই যা প্রযোজ্য, তাকে অনুভব করেছে। এই সত্যকে নট তীব্র করে তোলেন হয়ত, কিন্তু এ সবার। আমরা নানা রূপের; আমরা সবাই সাজবদল করি; সবার সত্তা খণ্ডিত। সাজবদল করতে গেলে ট্রান্সভেসটাইট তো হতেই হয়, ওই ইংরেজি শব্দটার অর্থই তাই। নিজের মধ্যে আরও বহু অস্তিত্বের মতো নারীকে অবিষ্কার করার কাজটা পুরুষ নটের একটা কাজ। একই সঙ্গে নারী ও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ এখানে অদ্ভুত কিছু নয়। নিজের শিল্পীসত্তা যাঁর সঙ্গে কিশোর বয়েস থেকে জুড়ে গেছে, যাঁর অভিনয় আরও বহু দর্শকের মতো অনুরাগীর চোখে দেখেছেন, সেই অর্ধেন্দুশেখরের কাছে এক অর্থে অমৃতলাল নিজেকে মনে মনে নিবেদন করেছেন। পুরুষ, নারী ইত্যাদি পরিচিতির বা আইডেন্টিটির ব্যাপার। 'অদামৃত' সন্ধি করে যে নামটা রাখা হয়েছে সেটা এক খণ্ডিত, দুই হয়ে যাওয়া সত্তার এক হওয়ার অভিলাষ দিয়ে বুঝলে বোধ করি ভুল হবে না।

অভিনয় এক বিপজ্জনক জিনিস, সেখানে আইডেনটিটি লঙ্ঘিত হয়। সেইজন্য ইতিহাসে কতবার নাট্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে!

ব্রাত্য বসু, *অদামৃতকথা*, কলকাতা: আনন্দ, ২০২২

মৈনাক বিশ্বাস : প্রাবন্ধিক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ্ ফিল্ম স্টাডিজ-এর অধ্যাপক।